Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 *(Index Copernicus International)*
UGC Approved, Journal No: 48666
Volume-VII, Issue-III, January 2019, Page No. 79-86
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

অমিয়ভূষণের গল্পে গঠনশৈলীর ভিন্নতা ও বহুস্বর

ঋতুপর্ণা সরকার
অতিথি অধ্যাপক পাকুয়াহাট ডিগ্রি কলেজ, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Amiyabhushan Majumdar (March 22, 1918–July 8, 2001) was an acclaimed Indian novelist, short-story writer, essayist and playwright. In a writing career spanning over four decades, Majumdar wrote numerous novels, short stories, plays and essays in Bengali. He wrote story of a different type of story that is not tied in the familiarity of Bengali short stories. Maybe that's why he is not familiar in the Bengali literature world. But nothing comes out of the great creation. There has been a separation of Amiyanbhushan from the safer way of movement. And one Majumdars like Kamlokumar, considered him as a well-read reader and critics 'author of writers'. We can understand the story of literature that is not the only entertainment, through its stories. Our survival graph is never straightforward. Love, hatred, love, stomach hunger and sexuality, curiosity and sweat, tears and blood - all mix together with a writer's ink. It's not the author's responsibility to point out what's good, which is bad. That is the responsibility of the social workers, the social worker, the Guru, the great men. Our main theme is discussing the story of Amiyabhusan, about his own personality.

Key words: Amiyabhushan, tati bou, avloner sarai, shortstory, spanning, familiarity.

এমন কিছু লেখক থাকেন, যাঁরা সাহিত্যসমাজে জনপ্রিয়তার ধার ধারেন না। নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে একেবারে নিজস্ব ভঙ্গিতে লেখনী চালনা করে যান। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দুই মজুমদারের নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় – একজন কমলকুমার, অন্যজন অমিয়ভূষণ। বাংলা গদ্যের এক অভিনব নির্মাণ তাঁকে তাঁর সমসাময়িকদের এবং অনেক পূর্বসূরিদের থেকে আলাদা করেছে, পাশাপাশি ভিন্ন ধারার বাঙালি লেখকদের অনেকের কাছেই এক বিকল্প প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে।

রবীন্দ্রনাথের পর, এমনকি দেশ-ভাগের পরেও আধুনিক বাংলা ছোটোগল্প পরিমাণে কম লেখা হয়নি। তবে প্রসঙ্গে আধুনিক অথচ ছোটোগল্প হয়ে উঠল না এরকম নমুনাও তো কম নয়। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতির মতো যাবতীয় নৈতিক সমস্যা ছাঁচে ঢালবার একটা সুলভ ছক হয়ে পড়েছে আধুনিক ছোটোগল্প। বিনোদন না হলে গল্প হবে না, প্রচার না হলে গল্প হবে না, সমাজের-সময়ের দলিল না হলে গল্প হবে না, যা ইচ্ছে তাই ফতোয়া জারি করেছেন যে কেউ। এ অবস্থায় এখনকার বাঙালি পাঠককে স্মরণ করানো দরকার – ইনিও ছোটোগল্প লেখেন, ইনি অমিয়ভূষণ মজুমদার।

লিখতে আরম্ভ করার ইচ্ছা এসেছিল নিজেকে বাঁচানোর তাগিদেই। পারিবারিক কয়েকটি দুর্ঘটনার স্মৃতি, পোস্টঅফিসে চাকরির সঙ্গে আপোষ, পারিবারিক প্রতিষ্ঠা বিচ্যুতি, সর্বোপরি নিজের প্রতিষ্ঠার অপসৃতি লেখককে মর্মাহত করে গেছে সারাজীবন। 'কেন লিখি' প্রবন্ধে তার'ই প্রশ্নবোধক অবতারণা—

> *"কেন? কেন আমাকে আমৃত্যু এই যন্ত্রণা?........এইসব অহেতুকী মৃত্যুযন্ত্রণা, এইসব প্রতিকারহীন আরোপিত চাপিয়ে দেওয়া ব্যর্থতা ট্রমা সৃষ্টি করে। এই ট্রমার উৎপাত থেকে পালাতেই হয়। রাতের গভীরে স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন নিয়ে ঘুমিয়ে ট্রমা ভোলা যায়। দিনের বেলায় কী করে বেচারা অধিদৈবত্ত? সে তাই, ট্রমাগুলোকে নিয়ে ভেঙে চুরে অর্ধচেতন অবস্থার দিবাস্বপ্ন তৈরি করে।"*[১]

নিজের অভাববোধ কিছুমাত্র ছিল না, কিন্তু চারিদিকের অভাববোধ উত্তাল ঢেউ হয়ে গ্রাস করতে চেয়েছিল লেখককে। এই রকম অবস্থায় ইতিপূর্বেই কাগজ-কলম নিয়ে সন্ধ্যার দিকে বসা অভ্যাস হচ্ছিলো। গল্পলেখার সূত্রপাত এইভাবে—

> *"একদিন স্ত্রী বললেন, টুকিটাকি কী লেখ, উনুন ধরাতে গিয়ে দেখি, একটা গল্প লেখ না। খেলার মতো মন নিয়ে ছুটির দিন পেয়ে গল্প লিখলাম। হঠাৎ কি করে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের পত্রিকা পূর্বাশার একটি কপি বাড়িতে এসেছিল। গল্পটা শেষ করে পরের দিন সকালে গল্পটা সঞ্জয়বাবুর নামে পাঠিয়ে দিলাম। ঠিক পনেরো দিন পরে এক কপি পূর্বাশা এল। দেখি, আশ্চর্য, আমার সেই গল্প প্রায় দশ পনেরো পৃষ্ঠা জুড়ে। এই শুরু, কিন্তু শুরুটা ভালো হল।"*[২]

বলাই বাহুল্য, ১৯৪৫-এ রচিত এই গল্পের নাম ছিল- 'প্রমীলার বিয়ে'। এরপর অনেক গল্প লিখলেও, অমিয়ভূষণের নিজের কাছে উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছিল যেগুলি, তার সংখ্যা বেশি নয়, যেমন- 'অ্যাভলনের সরাই', 'এপস অ্যান্ড পীকক', 'রাজীবোপাখ্যান', 'মোহিত সেনের উপাখ্যান', 'শ্রীলতার দ্বীপ', 'পায়রার খোপ', 'স্বর্ণসীতা', 'মধুসাধুখা' প্রভৃতি।

লিটিল ম্যাগাজিনে প্রকাশ করার অভ্যাসটি চিরকাল ধরেই অমিয়ভূষণে বর্তমান।
লক্ষ করলে দেখা যাবে, অমিয়ভূষণের গল্পগুলি আদ্যন্ত গল্পসমন্বিত। গল্প দিয়ে শুরু, মধ্যে গল্প, শেষটাতেও গল্পের-ই প্রসঙ্গ।

'অ্যাভলনের সরাই' গল্পটির শুরুতেই—

> "ব্রজেন ওদিক থেকে ফিরে এসে এই গল্পটা বলেছে।"[৩]

এবং তারপর—

> "এ রকম একটা নতুন উদ্বাস্তু দল কিংবা দলের ধ্বংসাবশেষ নিয়েই এই গল্প।"[৪]

'তাঁতী বউ' গল্পটি শুরু হয়েছে এভাবে—

> *"সব দেশের একটা যুগ আছে যাকে বলা হয় অন্ধকার-যুগ, আর একটা আছে যাকে বলা হয় আলোকের যুগ। বাংলাদেশে অধিকন্তু একটা আছে যা আনাড়ির তোলা ফটোগ্রাফের মতো গভীর অন্ধকার ও উজ্জ্বল আলোকের আকাঙ্খাহীন মিলনের যুগ। সেই যুগের গল্প এটা বলছি।"*[৫]

কিংবা 'দুলারহিন্‌দের উপকথা' গল্পের শেষ অংশটি—

> *"সন্ধ্যার অন্ধকারে কুপি জ্বেলে কড়াইয়ে ভাত চাপিয়ে সঙ্গীরা যখন দিনজামানার গল্প করে, দেশের গল্প করে, কোনও কোনও দিন সে চাটাই বিছিয়ে নীরবে অন্ধকারে আকাশের দিকে চেয়ে শুয়ে থাকে। তারপর শুধু গল্পটাই থাকবে।"*

বাংলা ছোটোগল্পের ইতিহাসে, প্রকরণে এই অভিনবত্ব আনকোরা। ফিরে-ফিরে একটা বৈঠকি গান যেন তৈরি হয়ে যায় পাঠকের মধ্যে।

'মামকাঃ' গল্পে—

> *"হতে পারে গ্রস্, তাহলেও হসপিট্যালের সার্জনের স্ত্রী, সে যদি নোংরা চেহারার লুঙ্গি-পরা একজনকে দেখা মাত্র বিচলিত হয়ে কুলির সাহায্যে প্লাটফর্ম থেকে কুড়িয়ে রিক্‌শায় জড়িয়ে ধরে বাড়ি নিয়ে আসে তবে তা আলোচনার বিষয় হয় না? সেই কনস্টেবল যে পৃথাকে তার কাছে নিয়ে গিয়েছিল সে কি আর গল্প করছে না?"*

আবার, 'এপ্‌স্ অ্যান্ড পিকক্' গল্পে—

> "ঠিক যেন রবিঠাকুরের সাজানো গল্প"[৭]

অথবা, *"জানালা থেকে সরে এল শমিতা। মনে মনে বলল, এটা একটা রগরগে কথা, একটা রংদার গল্প।"*[৮]

কিংবা, *"আচ্ছা, শমি, একটা গল্প বলি এস'। সৌম্য হাসল যেন। 'দেখ আমি ঔপন্যাসিক হতে পারি কিনা।"*[৯]

আঙ্গিকের এই নতুনত্ব শরৎচন্দ্রের বৈঠকি গল্পগুলির কথা মনে করিয়ে দিলেও বলাইবাহুল্য, বাংলা ছোটোগল্পের ধারায় এই প্রয়াস সম্পূর্ণ অভিনব।

অমিয়ভূষণের 'সাহিত্য' প্রসঙ্গে একটি বহুশ্রুত বিষয় হল -'ভাষা জটিলতা'। এমন অনেকেই রয়েছেন যাঁরা ছোটোগল্পের মধ্যে কেবল গল্প পেলেই পরিতৃপ্ত এবং অমিয়ভূষণের রচনা তাদের দুরূহের অন্তঃপুরে নিমন্ত্রণ করে। বুঝিয়ে দেয়- গল্প জানলেই তাঁর গদ্যকে চেনা ফুরিয়ে যায় না। আসলে, ছোটোগল্প অমিয়ভূষণের কাছে সেই কবিতা যা গদ্যে লেখা হয়। অন্য অনেকের মত শ্লথ, শিথিল, কথার অপরিপাটি, আনন্দিক জাল, উদ্দেশ্যহীনভাবে বুনে চলার পক্ষপাতী নন তিনি। তাই শব্দচয়নে, বাক্য গঠনে, যতি ব্যবহারে, অনুচ্ছেদ বিভঙ্গে এত তীক্ষ্ণ মনোযোগী। বয়নের এই পরিপাট্য তাঁর সমগ্র রচনায় ব্যঞ্জনার এক ধ্বনি এনে দেয়। তাঁর লেখায় কখনো কাদামাটির গন্ধমাখা আনকোরা দেশি শব্দ এসে পড়ে, তাতে গদ্যের শীলিত প্রসন্নতা একটুও ক্ষুণ্ণ হয় না, উপরন্তু ভাষার অন্তরঙ্গে শুচিবায়ুগ্রস্ততা নেই বলেই অবলীলায় লিখতে পারেন—

> *"পৃথা দুধ করে, বোতলে ভরে, ঘরে গিয়ে, ঠোঁটে আঙুল রেখে ডান তর্জনী ভাঁজ করে ঠোঁটের উপরে আলতো আলতো ছোঁয়ালেই ঘুমন্ত অবস্থাতেই পাখির ছানার মতো হাঁ করে মাই খোঁজে।"*[১০]

অর্ধশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি সম্পর্কে অবজ্ঞা এবং অশিক্ষিত মাটির মানুষদের প্রতি আশ্চর্য মমতা বোধ থেকেই এই ভাষা উৎসারিত সন্দেহ নেই। তাঁর সমূহ ছোটোগল্পগুলি একটি কল্পনাকুশল মননশীল ব্যক্তিত্বের বিচ্ছুরণ, তাতে এক সচেতন সংবেদনশীল সত্তার পরিচয় পরিস্ফুট। মনে হয় এগুলি যেন সৃষ্টি নয়, নির্মাণ। অতীতচারী মন তাঁর আশ্চর্য কুশলতায় মিলে যায় বর্তমানের সঙ্গে। কোথাও এতটুকু হোঁচট খায় না পাঠক, বরং অল্প পরিসরেও স্ফুট হয়ে ওঠে দীর্ঘজীবন।

কলকাতার ট্রপিক্যাল হাসপাতালে ভর্তি হয়ে ইংরেজদের প্রথম সংস্পর্শ হয়েছিল অমিয়ভূষণের মনের সঙ্গে। তাতেই মনে হয়েছিল ইংরেজরাও আসলে আমাদের মতোই মানুষ, রাক্ষস-ও নয়, আবার দেবতা-ও নয়। অনায়াসে তাদের ভাষার গঠনবিধি, বীফ, মদ আর পোশাককে বাদ দিয়ে তাদের কালচারের ফিলিস্টাইনজম্ লক্ষ করা যায় 'অ্যাভলনের সরাই', 'সাইমিয়া ক্যাসিয়া' গল্পগুলিতে। ছাত্র হিসেবে অমিয়ভূষণ ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। ইংরেজি সাহিত্যে সাম্মানিক স্নাতক হলেও গণিত, ইতিহাস, দর্শন, ভূগোল, সংস্কৃত এবং আইনশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল ঈর্ষনীয়, বাংলা সাহিত্যেও তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রতিফলন কোনও পাঠকের-ই নজর এড়ায়নি।

অমিয়ভূষণের গল্পে, রচনাশৈলীতে বর্ণনা অংশ কোনও সময়েই গুরুভার হয়ে ওঠেনি। আখ্যান শুধুমাত্র সংলাপ-আশ্রয়ী হলে, তাতে যেমন লেখকের অপটুত্ব প্রকাশ পায়, তেমনি বর্ণনার একঘেয়েমি, কথকের অতিরিক্ত উপস্থিতি-ও পাঠককে বিব্রত করে। কিন্তু অমিয়ভূষণ অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে, দক্ষতার সঙ্গে দু'য়ের সহাবস্থান ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। প্রয়োজন-বিশেষে, আঞ্চলিক শব্দনির্ভর সাবলীল সংলাপ, পাঠককে আরও বেশিমাত্রায় আকৃষ্ট করে তুলেছে পাঠকের প্রতি। বাচনস্তরে, কথনের বিন্যাসে লেখক কোথাও সর্বজ্ঞকথক হিসেবে 'আমি' বা 'আমরা' শব্দ ব্যবহার করেননি। পরিবর্তে 'আমরা' বা 'আমাদের' শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ পাঠককেও সর্বজ্ঞকথকের পাশের স্থানে বসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। এহেন কথনরীতি তাঁর রচনার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে মৌলিকত্ব দান করেছে, সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ'-র কথা মনে রেখেও বলা যায়, গদ্যের এই সুকুমার দৃঢ়তা বাংলা কথাসাহিত্যে প্রায় নেই বললেই চলে।

লক্ষ করলে দেখা যাবে- প্রান্তিক, কালো মানুষদের প্রতি দুর্বলতা অমিয়ভূষণের সাহিত্য জুড়ে। আদিবাসী মানুষদের শিল্প, সংস্কৃতি, জীবনসংগ্রাম বিভিন্ন আঙ্গিকে রূপায়িত হয়েছে তাঁর লেখা রচনাগুলিতে। 'দুখিয়ার কুঠি', 'নির্বাস' উপন্যাসদুটিতো উপজাতিদের ভাষাতেই লেখা। 'দুলারহিন্দের উপকথা' গল্পটিতেও সেই উপজাতি জীবনের-ই পরিচয় পাওয়া যায়—

> *"কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে চলে না বেটাছেলের। কাঁচা কাঁচাই হোক, আহারের সংস্থান না করেও কাঁচা কাশ কেটে বোঝা বোঝা মাথায় ব'য়ে এনে স্তূপাকার ক'রে ফেললো ভুখন কুঁড়ের সামনে। তারপর সারা বিকেল, সারা সন্ধ্যা, অনেক রাত অবধি অস্পষ্ট আলোয় ব'সে ব'সে নতুন ক'রে চাল ছাইলো ভুখন।"*[১১]

অন্ত্যজাতের প্রতি এই ভালোবাসা লেখক অল্প কথায় ব্যাখ্যা করেছিলেন ড. উত্তম দত্তকে দেওয়া একটি চিঠিতে—

> *"ব্যাসদেব কালো মানুষদের কথা বলেছেন। জন্মসূত্রে তিনিও অন্ত্যজ। আমার তো মনে হয় মহাভারত ব্যাসের নাতিপুতিরই গল্প। আমি নিজেকে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিলেও আমি মনে করি আমার শরীরেও দ্রাবিড়, অস্ট্রিক ও অনার্য গোষ্ঠীর রক্ত বইছে। পিতৃপরিচয়ে আমি ব্রাহ্মণ হলেও আমার মা ছিলেন উঁচু কপালের মহিলা। তিনি হয়ত জেলের মেয়ে।.....তাই আমি মনে করি, কোচ মেচ রাভা রাজবংশীয়রা আমারই সত্তার অংশ, আমার আত্মার আত্মজন। মহাভারত দেখো, অর্জুন কালো, দ্রৌপদী কালো, ব্যাস নিজে কালো। কালোরাই তখন রাজা, শ্রেষ্ঠ মানুষ...।"*

তবে, অন্ত্যজদের প্রতি সহানুভূতি থাকলেও, রাজা-রানী, জমিদার, জোতদার, মধ্যবিত্ত, লুম্পেন, প্রলেতারিয়েত কারো কথা-ই অবহেলা করেননি লেখক। গোটা সমাজের সকল মানুষের সমস্যাই সমান সহানুভূতিতে উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর রচনায়। এমনকি তারাও বাদ পড়েনি, যারা ভাষায় অভাবে নিজেদের অনুভূতি প্রকাশে অক্ষম।

অমিয়ভূষণ মানুষের কথা বলেছেন, অঞ্চলের কথা নয়, মানুষের কথা বলতে গেলে তাকে মাটিতে দাঁড় করাতে হয়, মাথার উপরে আকাশ দিতে হয়, আবহাওয়া, গাছ-গাছড়া দিতে হয়। আর এসব করতে গেলে নিজের চোখে দেখা মাটি, আকাশ, জল, গাছ আঁকা যতটা সহজ, অন্যের মুখে শুনে সে আঁকা তত সহজ নয়। সেজন্যই হয়ত পদ্মা থেকে শুরু করে কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্যন্ত পরিচিত ভূ-ভাগ বেশি স্থান পেয়েছে তাঁর রচনায়।

সেকালের সমাজ মানবমন সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে অমিয়ভূষণের প্রতিটি রচনায়। সামাজিক নান কুসংস্কারও এখানে দুর্লভ নয়। যেমন- 'তাঁতী বউ' গল্পটিতে ছেলের আকাঙ্খায় গোকুল নরমভাবে তার স্ত্রীকে বলে—

"এই দেখ কি এনেছি, এইটে হাতে বেঁধে দিই আয়, সিদ্ধি - থানের মাটি আছে এতে, দেকি তার ওরে কি হয়।...কিছুদিন ওরে বাঁদী গোকুলকে নিজে থেকে বলল, 'ফকির এসেছে ও গাঁয়ের মাঠে, যা?"[১২]

বাঙালি গল্পে স্ত্রী ও জননী প্রথম থেকেই একাকার, কিন্তু অমিয়ভূষণের গল্পের নায়িকা ময়নামতীর মতো এক শিশু স্বামীকে বুকে তুলে পথ পার হতে চায়। ভাই-বোনের নিষিদ্ধ সম্পর্কের ব্যবহারও এখানে দুর্লভ নয়। যেমন—

"দুলারহিন্ ছোটোবেলার ভঙ্গিতে শুয়ে আছে- যেমন করে ছোটোবেলায় বলতো, আমি মরে গেছি। উরু দুটি প্রসারিত, অর্ধনিমীলিত দৃষ্টি, ঈষৎ মুক্ত ঠোঁটদুটি, বুক কাঁপছে থর থর করে। কিন্তু দুলারহিন্ ধড়ফড় করে উঠে বসলো।"[১৩]

মূল্যবোধের অবমাননা নেই বলেই লেখক ঝোঁক দেন শেষ বাক্যটির ওপর—

"কিন্তু দুলারহিন্ ধড়ফড় করে উঠে বসলো।"[১৪]

এই গল্পের-ই অন্য যায়গায়—

"দুলারহিন্ একটা হাত রাখলো ভুখনের কাঁধে। ভুখন দু'হাতের সবটুকু জোর দিয়ে দুলারহিনের হাতখানা ছুড়ে ফেলে দিলো। যা কোনোদিন সে কল্পনাও করেনি, তেমনি ক'রে দুলারহিনের আধখোলা ঠোঁটের উপরে প্রচণ্ড একটা চড় মারলো সে।"[১৫]

যৌনসংসর্গের ঘটনা অমিয়ভূষণে কম, তবে টুকরো - টুকরো ইঙ্গিত প্রয়োজনমতো আসতেই থাকে। যেমন- 'তাঁতী বউ' গল্পটিতে—

"মানুষের শরীর যে এত তৃপ্ত হতে পারে কে জানত? শিরা-উপশিরাগুলির শূন্যতা পূর্ণ হয়ে সেগুলি এত স্নিগ্ধ হয়েছে যে মনে হচ্ছে শ্বেত চন্দন মাখা গায়ে ভোরের হাওয়া লাগছে। মনের খানিকটা অংশ জুড়ে (গোকুলের মনে হল বুকে) যে শুভ্রতা কমনীয় হয়ে উঠছিল, স্নিগ্ধ হয়ে উঠছিল তার একবার অনুভব হল সেটা শুভ্র উরুদেশের ছায়া। ঘরে ফিরে এসে সে দেখল তার শয্যায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে বাঁদী। রাত্রির স্বপ্নের সঙ্গে দিনের আলোর মিল দেখে সে অবাক হল একটু।"[১৬]

কিংবা—

"কিন্তু কাঁধের কাছে আঁচলটায় টান পড়তেই দুলারহিনের পা দু'খানাও বিবশ হ'লো। সে লোকটির গায়ের উপরে প'ড়ে গেলো, আর সেখান থেকে মাটিতে। তখন তার কষ বেয়ে ফেনাও গড়াতে লাগলো।"[১৭]

প্রকৃতিবাদী লেখকদের সারিতে তাঁকে বসাতে ইচ্ছে করে যখন দেখা যায়- তিনি বারবার ধর্ষণের দৃশ্যে ফিরে আসছেন। কিন্তু আসলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সামন্ততান্ত্রিক পিছুটান, শোষণের এক ভিন্নরূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, চোখে আলো ফেলে দেখিয়ে দিয়েছেন আমাদের।

'দুলারহিন্‌দের উপকথায়'—

"আমি টাকা চাই, অন্তত চার কুড়ি তো বটেই। ভাইকে টাকা দেবো আমি।
- চার কুড়ি? বেশ তাই হবে। আমার সঙ্গে বিয়ের পরেও ভাইকে টাকা দিতে ইচ্ছে হয়, দেখা যাবে।
- না, টাকাটাই আগে দিতে হবে।
- ও খুব দাম বাড়াতে পারো যা হোক। আগে দেখি কত দাম হতে পারে। এই বলে দুলারহিনের আঁচলের একপ্রান্তে চেপে ধরলো লোকটি।"[১৮]

বাস্তবতার একটি নতুন দিগন্ত প্রসারিত হয়ে গেছে এই নগ্ন প্রান্তর থেকে। সামাজিক পণ্য নারী। হিংস্রতার শিকার, একই সঙ্গে কামনার-ও বটে।

‘সাইমিয়া ক্যাসিয়া’ গল্পে—

> *“আবার যেন পেমার ভারি দেহটাকে টেনে তুলতে গেল সে, কিন্তু তখনই হয়তো পেমার উজ্জ্বল ত্বক চোখে পড়লো তার, কিংবা পেমার ছড়ানো পা দুখানা। তীব্র কালো অন্ধ আক্রোশে মেজরের তত্ত্ব আর অনুভূতি এক হবে গেলো, আর তখন তার দুহাতের নৃশংসতায় পেমার পেটিকোট ছিন্নভিন্ন হবে যেতে লাগলো।”*[১৯]

বহুমুখী এই বিন্যাস কৌশল সাহিত্যিক অমিয়ভূষণের জীবন সম্পর্কে গভীর অনুভূতির কথা-ই আমাদের মনে করিয়ে দেয়।

প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামের নানা অভিঘাত ‘অ্যাভলনের সরাই’, ‘উরুণ্ডী’, ‘পায়রার খোপ’, ‘মৃণ্ময়ী অপেরা’, ‘মামকা’ গল্পের চরিত্রগুলির মধ্যে লক্ষ করা যায়। নিজ জীবনেও এমন অভিজ্ঞতা বোধহয় দুর্লভ ছিল না। ‘নিজের কথা’ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

> *“১৯২৬ এই বোধহয় ঠনঠনে কালীবাড়ি আক্রান্ত হয়েছিল। ঢাকাতে দাঙ্গা হচ্ছিলো।.....বাবা বন্দুক কিনে আনলেন, কয়েক বাকসো পিতল মোড়া বুলেট। অনেকদিন রাতে বাবা বন্দুক হাতে গ্রামে ঘুরতে বেরোতেন। শুনতাম ওরা হিন্দুদের কেটে ফেলে, হিন্দুদের চুরি করে।....১৯৪৬ - ৪৭ পর্যন্ত এরকম একটা বিদ্বেষ ও ক্রোধ ছিলো মনে। ফলত সেইসব রাজনীতিক যারা দেশভাগের জন্য কংগ্রেস দলকে দোষ দিয়ে উদ্বাস্তু ভোট টানবার প্রয়াস করে চলেছে তাদের চিন্তাকে মিথ্যাশ্রয়ী মনে হতে থাকে।”*[২০]

এ’হেন অমিয়ভূষণ কখনো কোনও বিশেষ ‘তান্ত্রিক’ লেখক হতে চাননি। নিজেকে বামপন্থী বলতেও তাঁর প্রচণ্ড আপত্তি ছিল। কিন্তু খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষদের প্রতি সহমর্মিতা তাঁকে ‘ট্রেড ইউনিয়ন’ করতে বাধ্য করেছিল। তৈরি করেছিলেন নতুন ইউনিয়ন ডাক ও তার বিভাগ। এর ফলে যথেষ্ট ঝুঁকির-ও সম্মুখীন হয়েছিল তাঁকে বহুবার। কিন্তু তাঁর ট্রেড ইউনিয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক, ছাপমারা ট্রেডইউনিয়নের চেনা ছকে পড়ত না বলে, এই লাইনে প্রতিষ্ঠিত বলশালী সংগ্রামীদের সমর্থন তিনি পাননি বললেই চলে। সাহিত্যিক হিসেবেও তিনি কোনও ‘অমুকপন্থী’ সাহিত্যিক ছিলেন না। তাঁর মতে, সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই। দর্শন দর্শনের জন্য, বিজ্ঞান বিজ্ঞানের জন্য, তেমনি সাহিত্য-ও সাহিত্যে-র জন্য। সাহিত্যের মধ্যে জীবনের সব কিছুই থাকতে পারে, কিন্তু মূলকথা হল আর্ট, ক্রিয়েশন। ‘রহস্যময়তা’-ও তাঁর ছোটোগল্পের সহজাত কারুকাজ।

এক অর্থে, অমিয়ভূষণের সব ছোটোগল্প-ই যেন অনার্দ্র গদ্যে লেখা কান্নার গল্প, কান্না আসার গল্প, কান্না আটকে রাখার গল্প। কান্নার এই প্রসঙ্গটিকে তিনি বর্ণনা করেন না, ব্যাখ্যা করেন না, বরং ঢেউ যেমন স্বচ্ছন্দ সাবলীলভাবে সাঁতারুকে জলে তুলে দেয়, তেমনি এই চোখের জল চেতনা তরঙ্গের শীর্ষ থেকে শীর্ষে পাঠককে উত্তীর্ণ করে। যেমন ‘তাঁতী বউ’ গল্পে -

> *“দুঃখের গভীরতা যখন বেড়ে যায় তখন সে আঁ - আঁ করে কাঁদে। এক - একদিন সন্ধ্যায় বর্ষা নামে। বর্ষার শব্দের মধ্যে তার বোবা কান্নার শব্দ ছড়িয়ে পড়ে।”*[২১]

কিংবা ‘দুলারহিন্‌দের উপকথা’য়—

> *“নিঃশেষ শূন্য বুকে বোধহয় বেশীক্ষণ কাঁদাও যায় না। সেই ভুখনের মঙ্গলের জন্যই আজ সে পথে বেরিয়েছে।.....অনেক্ষণ কেঁদে মনের নিরুদ্ধ পীড়াগুলিকে ধুয়ে মুছে দু’জনে নিজের চাটাইয়ে একসময়ে ঘুমিয়ে পড়লো।”*[২২]

অমিয়ভূষণ চেতনানির্ভর জটিলতার চিত্রকল্প নির্মাণের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রতীক নির্মাণের সময় তিনি বিমূর্ত ধারণার (abstract) ব্যবহার করেননি। আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকেই বিষয় নির্বাচন করে তাকে ভিন্নমাত্রার অর্থ প্রদান করেছেন। যার ফলে তাঁর তৈরি প্রতীকগুলো তুলনায় সরল ও আকারে ছোটো। আর এজন্যই তারা অনেক বেশি মাত্রায় সার্থক ও আখ্যানের বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে সাযুজ্যমণ্ডিত। লেখকের পাণ্ডিত্যের বাহক হয়ে তারা গুরুভার হয়ে ওঠেনি।

চিত্রশিল্পী অমিয়ভূষণ দর্শনেন্দ্রিয় নির্ভর চিত্রকল্প তৈরির ক্ষেত্রে নানাবিধ রঙের ব্যবহার করেছেন। রং এর ব্যবহার তাঁর সাহিত্য শৈলীর এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। চিত্রকরের দৃষ্টি নিয়েই তিনি প্রকৃতি থেকে শুরু করে মানুষের মনোজগতের নানান ভাবকে সাহিত্যের ক্যানভাসে ভাষার সাহায্যে তুলে ধরতে চাইতেন। আর এক্ষেত্রে তাঁর অন্যতম সঙ্গী ছিল রং। অমিয়ভূষণ মূলত লাল-নীল-সবুজের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি করেছেন।

শোষিতদের নিয়ে গল্প লিখতে এমন শপথ তিনি করেননি বা লিখলে শোষিতদের উপভাষায় লিখতে হবে এমন দিব্যিও তিনি নিজেকে দেননি। প্রসঙ্গের টানে গদ্য আসবে, বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য যদি দরকার হয় অমিয়ভূষণ 'নিভাষা' ব্যবহার করবেন, অসামঞ্জস্য এড়ানোর জন্য যদি দরকার হয় তিনি উপভাষা বর্জন করবেন। তাঁর চরিত্রগুলি তাঁর সৃজনী-দৃষ্টিতে অবয়ব পায়, সমাজগত অস্তিত্বের নিহিত অর্জিত তাদের নিয়তি। তাঁর চরিত্রগুলির নিজস্ব বিবর্তন আছে, এ জন্যও তিনি বড়ো শিল্পী।

তবু দুঃখের সাথে বলতে হয়, অমিয়ভূষণ যত বড়োমাপের কথাশিল্পী, ঠিক ততখানি তো দূরে থাক, কীর্তির তুলনায় এক-দশমাংশ পারিমাণ সমাদর-ও তিনি পেয়েছেন কিনা সন্দেহ। যে ধারাবাহিক সাহিত্যিক অবহেলার তিনি শিকার, তাতে বাংলা সাহিত্যের যে সমূহ ক্ষতি, তাতে সন্দেহ নেই।

সূত্রনির্দেশ:

১. 'কেন লিখি'- অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র, তত্বীয় খণ্ড, দে'জ, গ্রন্থনা - তরুণ পাইন, অপূর্বজ্যোতি মজুমদার, পৃ: ১৬।
২. 'আমার সম্বন্ধে'- অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র, চতুর্থ খণ্ড, দে'জ, গ্রন্থনা-অপূর্বজ্যোতি মজুমদার, এণাক্ষী মজুমদার পৃ: ১৫।
৩. 'অ্যাভলনের সরাই'- শ্রেষ্ঠ গল্প, অমিয়ভূষণ মজুমদার, দে'জ, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯১৪, পৃ: ৩৬।
৪. "ঐ"
৫. 'তাঁতী বউ' - শ্রেষ্ঠ গল্প, অমিয়ভূষণ মজুমদার, দে'জ, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯১৪, পৃ: ৯।
৬. 'দুলারহিন্দের উপকথা'- শ্রেষ্ঠ গল্প, অমিয়ভূষণ মজুমদার, দে'জ, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯১৪, পৃ: ৩৫।
৭. "ঐ" – পৃ : ৭২ ।
৮. "ঐ" – পৃ : ৭৩ ।
৯. "ঐ" – পৃ :৭৩ ।
১০. 'মামকা' – অমিয়ভূষণ মজুমদার
১১. 'দুলারহিন্দের উপকথা' – প্রাগুক্ত, পৃ : ২৫ ।
১২. 'তাঁতী বউ' – প্রাগুক্ত, পৃ : ১৩ ।
১৩. 'দুলারহিন্দের উপকথা' – প্রাগুক্ত, পৃ : ৩৩ ।
১৪. "ঐ" – পৃ : ৩৩ ।

১৫. “ঐ” – পৃ : ৩৪ ।
১৬. ‘তাঁতী বউ’ – প্রাগুক্ত, পৃ : ১২।
১৭. ‘দুলারহিন্‌দের উপকথা’ – প্রাগুক্ত, পৃ : ৩০ ।
১৮. “ঐ” পৃ : ৩০ ।
১৯. ‘সাইমিয়া ক্যাসিয়া’ – ঐ, পৃ : ১১৬।
২০. ‘নিজের কথা’ – প্রাগুক্ত, পৃ : ১০।
২১. ‘তাঁতী বউ’ – প্রাগুক্ত, পৃ : ১৮ ।
২২. ‘দুলারহিন্‌দের উপকথা’ – প্রাগুক্ত, পৃ : ৩০ ।